ঃ ব্রুনারের শিখন ও শিক্ষণের তত্ত্ব

সূচনা

জেরোম ব্রুনার (Jerome Bruner) এবং তাঁর সহযোগী গবেষকগণ প্রত্যক্ষণের গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ১৯৬০ সালে 'The Process of Education' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে শিখন ও শিক্ষণ সম্পর্কে মতবাদটি তুলে ধরা হয়। ব্রুনার মনে করেন যে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি নিজস্ব সংগঠন (Structure) আছে। সেই সংগঠনটি অনুধাবন করতে সমর্থ হলেই শিখন সংগঠিত হয়। এই পর্যায়ে 'সংগঠন' কথাটিকে তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়ের অভ্যন্তরে যে মূল ধারণাটি নিহিত রয়েছে তাই হল তার সংগঠন। বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে এটি একটি মৌলিক ধারণা। একে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়, যেমন— চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়, সূত্রের ভিত্তিতে প্রকাশ করা যায়, আবার বাক্যের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি তুলে ধরা হল। সাপেক্ষীকরণ একটি মৌলিক ধারণা। এই শব্দটিকে বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। আবার স্বাভাবিক উদ্দীপক, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, কৃত্রিম উদ্দীপক এবং কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্কটিকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে সাপেক্ষীকরণের ধারণাটি ব্যক্ত করা যায়। অন্যদিকে সূত্রের সাহায্যেও একে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ কতকগুলি সমজাতীয় ঘটনা উল্লেখ করে সামান্যীকরণের ভিত্তিতে সাপেক্ষীকরণ সম্পর্কে সূত্র গঠন করা যায়। যেমন, প্যাভলভের কুকুর নিয়ে পরীক্ষা, ওয়াটসনের পিটার-আলবার্টের পরীক্ষা, হোলিংওয়ার্থের ভেড়া নিয়ে পরীক্ষা ইত্যাদির ভিত্তিতে সাপেক্ষীকরণের ঘটনাটিকে সূত্রের আকারে প্রকাশ করা যায়। আবার $(a+b)^2$ একটি মৌলিক ধারণা। একে বাক্যের সাহায্য প্রকাশ করা যায়, সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় এমনকি চিত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। $(a+b)^2$ যদি চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে হয়, তাহলে তার চিত্রিত রূপটি হল—

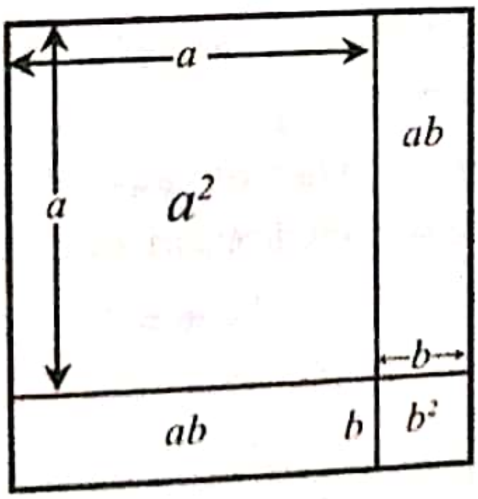

Scanned by CamScanner

সাপেক্ষীকরণ বা $(a+b)^2$-এর মধ্যে নিহিত এইরূপ মূল ধারণাকেই ব্রুনার সংগঠন বা রূপ হিসাবে অভিহিত করেছেন।

ব্রুনার বৌদ্ধিক বিকাশের ধারাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। তবে তিনি মনে করেন যে এইরূপ বিকাশের ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রতিনিধিত্ব তন্ত্র (representation system) কাজ করে। প্রতিনিধিত্ব হল এমন কিছু নিয়মাবলি যার ভিত্তিতে ব্যক্তি (individual) অভিজ্ঞতাসমূহ অর্জন করে থাকে। এই পর্যায়ে তিন ধরনের প্রতিনিধিমূলক তন্ত্র হল— ক্রিয়া (action), ভাবমূর্তি (image) এবং সংকেত (symbol)। এইগুলি হল জ্ঞান আহরণের এক একটি মাধ্যম এবং এইগুলির ভিত্তিতে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি স্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হয়। তবে প্রত্যেকটি তন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমগুলি হল যথাক্রমে ক্রিয়ানুষ্ঠানমূলক প্রতিনিধিত্ব (Enactive Representation), প্রতিমূর্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব (Iconic Representation) এবং সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব (Symbolic Representation)। এই মাধ্যমগুলি আবার এক একটি বিশেষ স্তরে (stage) কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যেমন— শৈশবে (infancy) ক্রিয়ানুষ্ঠানমূলক প্রতিনিধিত্ব, প্রাথমিক বাল্যকালে (Early childhood) প্রতিমূর্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব এবং প্রান্তীয় বাল্যকালে (Late childhood) সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে কাজ করে। অর্থাৎ শিশুর সংগঠনটি তার জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। প্রথম স্তরে অর্থাৎ শৈশবে কোনো বস্তু সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা শিশু সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে প্রকাশ করে। অর্থাৎ সে তার অর্জিত অভিজ্ঞতাটি দৈহিক সঞ্চালনের মাধ্যমে ব্যক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে শিশু যখন সাইকেল সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়; তখন সে তার হাত দুটো সামনে সোজাভাবে স্থির রেখে সাইকেলের প্যাডেল (Paddle) করার মতো পা দুটোকে ঘোরায়। এই পর্যায়ে জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা ক্রিয়ানুষ্ঠানমূলক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং তা স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়। তাই ব্রুনার মনে করেন যে বৌদ্ধিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে শিশুকে ক্রিয়ানুষ্ঠানমূলক প্রতিনিধিত্ব তন্ত্রের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। **দ্বিতীয় স্তরে** অর্থাৎ প্রাথমিক বাল্যকালে ছেলেমেয়েরা তাদের অভিজ্ঞতা সমূহকে প্রতিমূর্তির আকারে সংরক্ষণ করে। এই পর্যায়ে বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে দৃশ্যমান (visible) অবস্থার প্রাধান্য থাকায় তারা তাদের অভিজ্ঞতা কল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ব্রুনার বাল্যকালের ওইরূপ কল্পকে ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই তিনি এই স্তরের নাম দিয়েছেন প্রতিমূর্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব। **তৃতীয় স্তরে** অর্থাৎ প্রান্তীয় বাল্যকালে তারা কোনো বিষয়ের সংগঠনভিত্তিক যুক্তি, চিহ্ন বা সংকেতের মাধ্যমে সংরক্ষিত করার চেষ্টা করে। প্রথম স্তরের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তা কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ পায় প্রতিমূর্তির সাহায্যে। আর তৃতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব ঘটে সাংকেতিকীকরণের মাধ্যমে। এটি মূলত ভাষাভিত্তিক। উদাহরণের সাহায্যে সমগ্র বিষয়টি

বৌদ্ধিক বিকাশের স্তর

Scanned by CamScanner

তুলে ধরা হল। 'টেলিফোন' শব্দটির সঙ্গে শিশু যখন প্রথম পরিচিত হয়, তখন হাতটিকে কানের কাছে এনে টেলিফোনের মতো করে দেখায়। এটি হল ক্রিয়ানুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব। প্রাথমিক বাল্যে অনেকগুলি ছবির সাথে টেলিফোনের ছবি থাকলে শিশু সে চিনতে পারে, আর প্রান্তীয় বাল্যে টেলিফোনের ধারণাটি বিমূর্ত আকারে তাদের স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখে। ব্রুনার শেষোক্ত স্তরটির নাম দিয়েছেন সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব স্তর। এই পর্যায়ে ব্রুনার মনে করেন যে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন স্তর অবলুপ্ত হয়ে যায় না। বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি স্তরই সহ-অবস্থান করে অভিজ্ঞতার সাংকেতীকরণ ঘটায়। ফলে শিখনের জন্য তিনটি স্তরই অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তৃতীয় স্তরের সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে সম্ভব হওয়া সম্ভব নয়। কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতা আয়ত্ত ও সংরক্ষণ করতে তাকে 'এর' জন্য আভ্যন্তরীণ ভাষামূলক নীতি (internalised verbal formula) থাকা বাঞ্ছনীয়।

বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি স্তর উল্লেখ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি অন্য ধরনের শিখনের কথা উল্লেখ করেন। ব্রুনার এর নাম দিয়েছেন উদ্ভাবনমূলক শিখন (Discovery Learning)। এই ধরনের শিখনের মূল কথা হল জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্যের উদ্ভাবন। কোনো সমস্যা শিশুর সামনে পূর্ব পরিকল্পনামাফিক প্রদর্শন না করে শিশুর সামনে সমস্যাটি সরাসরিভাবে উপস্থাপন করলে

উদ্ভাবনীমূলক শিখন

শিশু তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমস্যাটির সমাধান করতে সমর্থ হয়। এই ধরনের শিখনই হল উদ্ভাবনমূলক শিখনের নামান্তর। এইরূপ শিখন অর্থবহ হওয়ায় শিশু নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে এবং নিজে নিজে সমস্যা সমাধান করার যোগ্যতা অর্জন করে। ফলে এই ধরনের শিখনের স্থায়িত্ব অনেক বেশি হয়।

পাঠক্রম চর্চায় প্রয়োগ

ব্রুনারের শিখন ও শিক্ষামূলক তত্ত্বটি পাঠক্রম চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর এই তত্ত্বে উল্লেখিত হয়েছে যে শৈশবে কোনো কাজ বা বিষয়বস্তু ক্রিয়াগত দিক বা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে প্রকাশ করলে খুব সহজেই ছেলেমেয়েরা শিখতে পারে। দ্বিতীয় স্তরে ছবি বা মডেলের সাহায্যে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। আর তৃতীয় স্তরে ভাষা, যুক্তি, চিহ্ন ইত্যাদির সাহায্যে কোনো অভিজ্ঞতা বিমূর্ত আকারে ভাবার সাহায্যে অর্জন করে। সুতরাং পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ব্রুনারের তত্ত্বকে কাজে লাগাতে হলে নিম্নলিখিত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

(ক) শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়বস্তুগুলিকে আগ্রহভিত্তিক করে তুলতে হলে বৌদ্ধিক বিকাশের তিনটি স্তর অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠানের স্তর, প্রতিমূর্তিমূলক স্তর এবং সাংকেতিক স্তর অনুযায়ী সেগুলিকে বিন্যস্ত করতে হবে। পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে ওই ক্ষেত্রে সদা জাগ্রত থাকতে হবে।

Scanned by CamScanner

(খ) উদ্ভাবনীমূলক শিখন সংঘটিত হয় জানা তথ্য থেকে। তাই পাঠক্রম উন্নয়নকারী বিষয়বস্তু এমনভাবে সজ্জিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং তাদের উদ্ভাবনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। এ ছাড়া আবিষ্কারমূলক শিখন যাতে যথাযথভাবে সমস্যা সমাধানমূলক শিখনে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয় তারও ব্যবস্থা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(গ) পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এমনভাবে স্তর অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচিত অভিজ্ঞতাসমূহ আয়ত্ত করতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

(ঘ) ব্রুনার বৌদ্ধিক বিকাশের স্তরকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রতি পর্যায় শিক্ষার্থীদের বয়স, যোগ্যতা, গ্রহণ ক্ষমতা, প্রাক্-অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে আলাদা। ফলে বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের কাঠামোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। যাতে পূর্ব স্তরের ভিত্তিতে পরবর্তী নতুন স্তরের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সহজ হয়।

(ঙ) ব্রুনার বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে স্তরভিত্তিক পর্যায়ের কথা বলেছেন তাকে বাস্তব রূপ দিতে হলে পাঠক্রমের বিষয়বস্তুকে ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা যাতে একটির পর একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা পাঠক্রমের মধ্যে রাখতে হবে। ফলে এই পর্যায়ে পাঠক্রমের বিষয়বস্তুকে পেঁচালো (Spiral) পদ্ধতিতে সজ্জিত করতে হবে। পেঁচালো পদ্ধতিতে বিন্যাস হল পাঠক্রমের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের বয়স, বিকাশের ধারা, শ্রেণি (class)-র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহজ থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং ক্ষুদ্র অংশ থেকে বৃহৎ অংশ অনুসারে বিন্যস্তকরণ।

(চ) ব্রুনারের শিখন ও শিক্ষণের তত্ত্ব যা উদ্ভাবনীমূলক শিখন নামে পরিচিত তার উপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করলেই চলবে না, শিক্ষার্থীরা কীভাবে নির্বাচিত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে তারও নির্দেশ পাঠক্রমের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এই তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও পরবর্তী ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণ সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা তার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তথ্য থেকে তত্ত্ব আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত থেকে বিমূর্ত চিন্তনে সক্ষম হবে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিমাণ তথ্যের বিন্যাসের উপরই নির্ভর করে। ফলে এই দিক থেকে পাঠক্রম চর্চায় ব্রুনারের তত্ত্বের প্রয়োগ একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়।

উপসংহার

Scanned by CamScanner

[redacted] ঃ পাঠক্রম প্রণয়নের উপাদানগত নীতি

শিক্ষার কাজ হল ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণসাধন করা অর্থাৎ শিক্ষা একদিকে যেমন ব্যক্তির কল্যাণসাধন করবে অন্যদিকে তেমনি সমাজের উন্নতিসাধন করতে সমর্থ হবে। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি লক্ষ করা যায়। তা হল—(১) শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিগত গুণাবলির বিকাশ সাধন করবে। (২) শিক্ষা শিশুকে বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে অভিযোজনে সক্ষম করে তুলবে। (৩) শিক্ষা ব্যক্তিকে উপার্জনে সক্ষম করে তুলবে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই তিনটি ধারার উপর গুরুত্ব প্রদানের কথা বলেছেন। উপরোক্ত ধারাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে কার্যত শিক্ষা হয়েছে একটি জীবনকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া (Life centred process)। এইরূপ ধারণাকে সামনে রেখে পাঠক্রম প্রণয়নের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে কতকগুলি উপাদানের ভিত্তিতে পাঠক্রমের মূল কাঠামোটি রচিত হবে। এই উপাদানগুলি হল—(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি (খ) শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য এবং (গ) প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা।

ভূমিকা

(ক) পাঠক্রম ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ঃ পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কারণ পাঠক্রমের প্রধান কাজ হল শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলা। পাঠক্রম কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকা বা পাঠ্যসূচির যোগফল নয়, বরং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সুসমন্বয় হল পাঠক্রম। এই ধরনের পাঠক্রমই শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এক্ষেত্রে শিক্ষার দুটি সজীব উপাদান—যথাক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পরিবেশে পাঠক্রমকে কেন্দ্র করে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। এরই ফলে শিক্ষামূলক পরিবেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্রে শিক্ষক পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে থাকেন। তাই পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাগুলি যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহভিত্তিক এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। তা না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। অপরদিকে সমাজপরিবেশ সতত পরিবর্তনশীল। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে ব্যক্তিকে সদা খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধান ব্যক্তি নতুন নতুন অভিযোজন কৌশল আয়ত্ত করে। তবে কোনো কৌশলই চরম বা স্থায়ী নয়। তাই পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহ পরিবর্তনশীল হওয়া প্রয়োজন। পাঠক্রমটিকে কখন পরিবর্তন করতে হবে তা শিক্ষার উদ্দেশ্যই আমাদেরকে সচেতন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমটি যথাযথ হয়েছে কিনা তাও যাচাই করতে সাহায্য করে। কারণ পাঠক্রমটি সুসমন্বিত ও সুগঠিত হলে তা শিক্ষার উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে এবং শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করবে। সুতরাং পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচন, শিশুর মধ্যে আগ্রহ জাগরণ এবং পাঠক্রমের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই পাঠক্রম হবে শিক্ষার উদ্দেশ্যভিত্তিক।

ভূমিকা

Scanned by CamScanner

পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মৌলিক বিচার্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সমস্যা হল এই যে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করায় শিক্ষার কোনো একক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাগুলিকে যুক্ত করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষার্থীর প্রত্যাশার ভিত্তিতে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) চরম উদ্দেশ্য ও (২) তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য। চরম উদ্দেশ্যগুলি হল শিক্ষার আদর্শগত দিক এবং তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যগুলি হল শিক্ষার বাস্তব দিক। পাঠক্রম রচনাকালে এই দুই ধরনের উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে সমস্ত ধারণা ব্যক্ত করেছেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে তিন ধরনের উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তা হল—শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বিকাশ সাধন, শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ সাধন এবং শিক্ষার্থীকে উপার্জনে সক্ষম করা। এগুলিকে যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহলে সেই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ (১) শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বিকাশ উপযোগী অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (২) শিক্ষার্থীর সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বিকাশের জন্য এমন সব অভিজ্ঞতা এবং কার্যাবলি সংযোজন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর সার্বিক সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। (৩) পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীকে উপার্জনে সক্ষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম এবং অভিজ্ঞতার কথাও বিবেচনা করা দরকার যাতে সে বৃত্তিমুখী দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। সুতরাং পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে তিন ধরনের উদ্দেশ্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। শিক্ষাবিদ্‌দের মতে এই উদ্দেশ্যের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু এক্ষেত্রে পাঠক্রম রচনায় কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা দূর করার জন্য শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে কতকগুলি বাস্তব উপযোগী শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার কথা বলেছেন। এগুলিকে বলা হয় শিক্ষার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য। পাঠক্রম রচিত হবে শিক্ষার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।

চরম উদ্দেশ্য

শিক্ষার প্রথম চরম উদ্দেশ্য হল চারিত্রিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন করা। শিক্ষার এই চরম উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করলে যে সমস্ত তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য পাওয়া যায় তা হল শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ ঘটানো যার দ্বারা শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের পথ সুগম হয়। এই বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল—শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা; চিন্তাশক্তি, যুক্তিশক্তি ও বিচারশক্তি শাণিত করা; নৈতিক দিক থেকে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো ইত্যাদি। আবার শিক্ষার দ্বিতীয় চরম উদ্দেশ্য হল সামাজিক বিকাশ ও সামাজিক কল্যাণসাধন। শিক্ষার এই চরম উদ্দেশ্যটিকে বিশ্লেষণ করলে যে কয়েকটি তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য পাওয়া যায়.তা হল— শিক্ষার্থীকে সামাজিক অভিযোজনে সক্ষম করা, সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত করা,

তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য

Scanned by CamScanner

সমাজিক ঘঠনাবলির মূল্যায়নে সহায়তা করা। অন্যদিকে শিক্ষার তৃতীয় চরম উদ্দেশ্যটি হল শিক্ষার্থীকে উপার্জনে সক্ষম করা। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করলে যে কয়েকটি তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়, তাহল —বৃত্তিমূলক বিষয়ে জ্ঞান সরবরাহ করা, বৃত্তিমূলক কাজে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে সমর্থ করা।

আদর্শ ও জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম রচনা করতে হলে শিক্ষার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে নির্ধারণ করতে হবে। তবেই পাঠক্রমটি যথোপযুক্ত ও কার্যকরী হবে। এই ধরনের পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে; তার চিন্তাশক্তি, বিচারক্ষমতা ও যুক্তিশক্তির বিকাশ ঘটে; শিক্ষার্থী সামাজিক অভিযোজনে সক্ষম হয়; সামাজিক ঘটনাবলির সাথে পরিচিত হয় এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। পাঠক্রম রচনার প্রক্রিয়াটি নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

জীবন কেন্দ্রিক পাঠক্রমের উপকারিতা

চরম উদ্দেশ্য	তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য	পাঠক্রম
(১) চারিত্রিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ	(i) দৈহিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা (ii) চিন্তাশক্তি, যুক্তিশক্তি ও বিচার শক্তি বিকাশ ঘটানো (iii) মূল্যবোধের বিকাশ	শারীর শিক্ষা গণিত ভৌতবিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞান ভাষা ও সাহিত্য
(২) সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ	(i) অভিযোজন ক্ষমতার বিকাশ (ii) সামাজিক রাজনীতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো (iii) সামাজিক ঘটনার মূল্যায়ন	ইতিহাস ভূগোল সমাজসেবা
(৩) উপার্জনে সক্ষম করা	(i) জ্ঞানের প্রসারণ (ii) দক্ষতা বৃদ্ধি (iii) জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ	গণিত ভৌতবিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞান কর্ম শিক্ষা

প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে চরম উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা হয়, তৃতীয় পর্যায়ে তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যের নিরিখে পাঠক্রমের একক অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচন করা হয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে শিক্ষার সার্থকতা তখনই আসবে যখন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনের লক্ষ্য রেখে পাঠক্রমটি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। আর

Scanned by CamScanner

তারই ফলে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মূল্যবোধগত, সাংস্কৃতিগত এবং বৃত্তিগত ক্ষমতার উন্মোচন ঘটবে।

(খ) পাঠক্রম এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য ঃ আধুনিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিশুর চাহিদা এবং সামর্থ্য। তাই পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা, চাহিদা সম্ভবনা, সামর্থ্য ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। প্রধানত শিক্ষাবিদগণ এক্ষেত্রে যে সমস্ত দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল—

(১) **পরিণমন ঃ** পাঠক্রম রচনার সময় শিশুর পরিণমন (maturation) স্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। শিশুর বিকাশ পরিণমনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ শিশুর শিখন ক্ষমতা, চিন্তন ক্ষমতা, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ভর করে পরিণমনের উপর। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কোনো অভিজ্ঞতা যেন শিশুর পরিণমনের স্তরকে অতিক্রম করে না যায়। তাহলে সেই পাঠক্রম কোনো কাজে আসবে না।

(২) **আগ্রহ ঃ** শিশুদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বয়সে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর সক্রিয়তা নির্ভর করে তার আগ্রহের পরিতৃপ্তির উপর। আবার শিক্ষার্থীরা বিষয়ের প্রতি যত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করবে, তত বেশি পরিমাণে তারা সেই বিষয়ে মনোযোগী হবে। তাই পাঠক্রম রচনার সময় অভিজ্ঞতাগুলি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রভিত্তিক হয় সেই দিকে সবিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(৩) **চাহিদা ঃ** শিশুর জীবনে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত চাহিদাগুলিকে মনোবিদগণ যে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন তা হল—জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা ও সামাজিক চাহিদা। মূলত চাহিদাগুলিই কর্মপ্রেরণের উৎস। শিশুর মধ্যে চাহিদা জাগরিত হওয়ার ফলে তার মধ্যে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শিশু বিভিন্ন ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে।

পরিশেষে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ফলে তার চাহিদার নিবৃত্তি ঘটে। তাই শিশুর চাহিদাগুলি যাতে পরিতৃপ্ত হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাবিদগণ পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। এগুলি হল— (i) পাঠক্রমের মধ্যে এমন সব অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেগুলি শিশুর জৈবিক চাহিদাগুলিকে পরিতৃপ্তি করবে। এজন্য তাঁরা পাঠক্রমের মধ্যে জীবনবিজ্ঞান, শারীর শিক্ষা কর্মশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। (ii) আবার শিশুর মানসিক চাহিদাগুলিকে পরিতৃপ্ত করার জন্য পাঠক্রমে ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি সংযোজনের কথা বলেন। (iii) অন্যদিকে পাঠক্রম এমন সব অভিজ্ঞতা যুক্ত করা প্রয়োজন যেগুলি শিশুর সামাজিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। এই রকম বিষয়গুলি হল— ইতিহাস, ভূগোল, সমাজসেবা ইত্যাদি। তবে প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, প্রথমে শিশুর চাহিদাগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর সেই চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন

Scanned by CamScanner

সব অভিজ্ঞতা নির্বাচন করতে হবে। নিম্নে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কী ধরনের পাঠক্রম হ
উচিত তার একটি নমুনা দেওয়া হল—

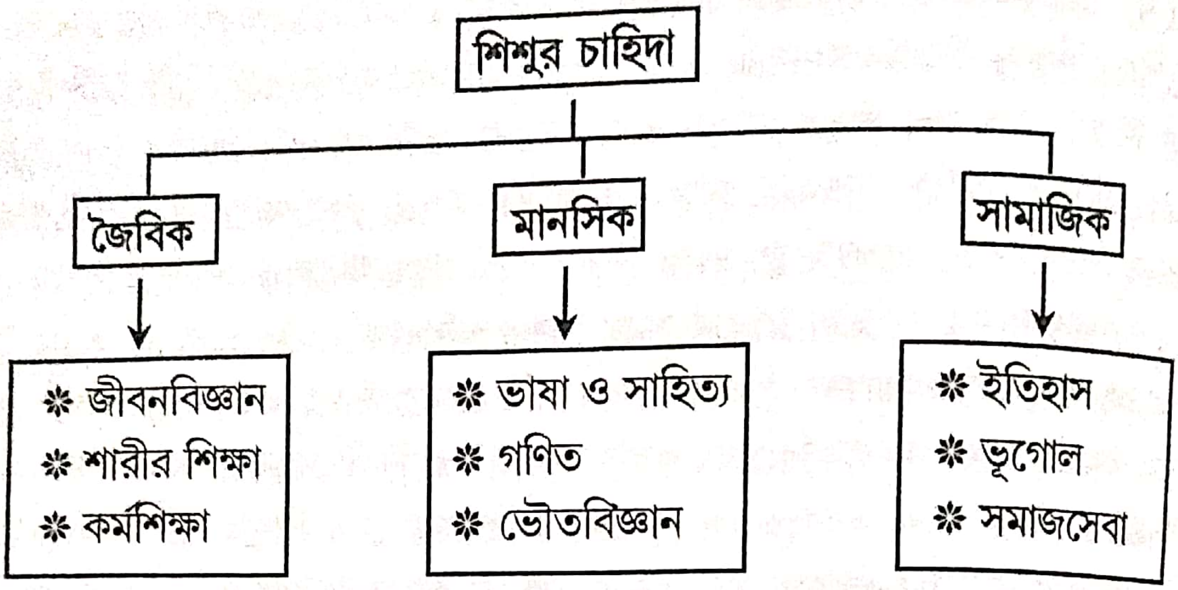

(৪) **মানসিক প্রবণতা ঃ** শিশুর মধ্যে কতকগুলি মানসিক প্রবণতা রয়েছে। সেগুলি হল কৌতূহলের প্রবণতা, দলবদ্ধভাবে থাকার প্রবণতা ইত্যাদি। এই প্রবণতাগুলি শিশুকে বিভিন্ন কাজে দক্ষ করে তোলে। শিশুর জীবনে এই প্রবণতাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিশুকে যদি তার প্রবণতা অনুযায়ী পরিচালিত করা যায় তাহলে সে খুব সহজেই জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। সেজন্য পাঠক্রমে এমন সব অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা থাকবে যাতে.বা তার নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। তবেই তার জীবনে সাফল্য আসবে।

(৫) **মানসিক ক্ষমতা ঃ** শিশু স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ক্ষমতাগুলিই যে কোনো কর্মের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক। এই ক্ষমতাগুলিই শিশুকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। মনোবিদ স্পীয়ারম্যান (Spearman) মানসিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে দুধরনের উপাদানের কথা বলেছেন —একটি সাধারণ উপাদান যা বুদ্ধির সমতুল্য এবং অপরটি হল বিশেষ উপাদান যা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাগুলি সংখ্যায় অগুনতি। প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে কোনো না কোনো বিশেষ ক্ষমতা বর্তমান। এইসব ক্ষমতা পরিতৃপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই ক্ষমতাগুলিই তাকে পরবর্তীকালে সঠিক বৃত্তির নির্দেশ দেয়। তাই এমন সব কর্ম ও অভিজ্ঞতা পাঠক্রম সংযুক্ত করতে হবে যাতে সে বিশেষ মানসিক ক্ষমতাগুলি প্রকাশের সুযোগ পায়। তবে তার সামর্থ্যকে উপেক্ষা করলে চলবে না। দেখতে হবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ যেন তার সামর্থ্য মাত্রাকে ছাপিয়ে না যায়। কারণ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাগুলি যদি শিক্ষার্থী অর্জন করতে সমর্থ না হয়, তাহলে পাঠক্রমের কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। যত ভালোই পাঠক্রম হোক না কেন সেই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবনে কোনো কাজেই আসবে না।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য

Scanned by CamScanner

রেখে পাঠক্রম রচনা করা দরকার। তার চাহিদাগুলি যদি মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে, সমাজগতভাবে এবং দৈহিক বিকাশগত দিক থেকে বিচার করে তার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে মৌলিক চাহিদা আছে। সুতরাং তার পরিতৃপ্তির জন্য পাঠক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিষয়বস্তু এমন হবে যা তার চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির মাধ্যমে সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তাকে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করবে।

(গ) পাঠক্রম ও প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ঃ প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রমকে কার্যকরী করতে হলে বিদ্যালয়গুলিকে যথাযোগ্য সুযোগ প্রদান করতে হবে। তবেই শিক্ষাকে সার্থক রূপদান করা সম্ভব হবে। তা না ফলে পাঠক্রমের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে এবং সমগ্র শিক্ষা-প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবে। সেজন্য পাঠক্রম রচনাকালে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল—

(১) বিদ্যালয় পরিবেশ ঃ পাঠক্রম রচনার সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আমাদের গোচরে আনতে হবে। এই পর্যায়ে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাঠক্রমে সংযোজন করতে হবে যেগুলি বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে অনুশীলন করার সুযোগ আছে। উন্নত কর্ম এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে পাঠক্রম রচিত হলে তাকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব। তা না হলে সেটিকে আদর্শ পাঠক্রম হিসাবে আখ্যায়িত করা যাবে না। যে অভিজ্ঞতাটি শহরাঞ্চলে প্রযোজ্য, সেটি গ্রামাঞ্চলে প্রযোজ্য হবেই এমন কোনো কথা নেই। কিংবা এর বিপরীতটিও সত্য। যেমন—উদ্যান রচনা গ্রামাঞ্চলে যতটা সহজে কার্যকরী করা সম্ভব, শহরাঞ্চলে কার্যকরী করা ঠিক ততটাই কঠিন। তাই পাঠক্রমে এমন সব অভিজ্ঞতা বা কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে যেগুলি উক্ত পরিবেশের মধ্যে সহজলভ্য হয়।

(২) বিদ্যালয়ের কাজের সময় ঃ বিদ্যালয়ের কাজের সময়কে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিষয় নির্বাচনের সময় দেখতে হবে যে পাঠক্রমটি যেন নির্দিষ্ট কর্ম দিবসের (Working days) মধ্যে শেষ হয়। আর সেভাবে বিদ্যালয়ের সময় তালিকাও (Time table) প্রস্তুত করতে হবে। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাসমূহের পরিমাণ যদি খুব বেশি হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট কর্মদিবসের মধ্যে অভিজ্ঞতাগুলি আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হবে। তার ফলে পাঠক্রমটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সেজন্য পাঠক্রম রচনার সময় বিদ্যালয়ের কাজের দিনের সংখ্যার দিকটিও বিবেচনা করতে হবে। অভিজ্ঞতা ও কাজের দিনের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। শুধুমাত্র কর্মদিবসের দিকে গুরুত্ব দিলে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে কয়টি পিরিয়ডের মধ্যে শেষ করতে হবে তাও নির্দেশ থাকবে পাঠক্রমে।

(৩) তথ্যপ্রাপ্তি ঃ পাঠক্রম রচনার সময় তথ্য প্রাপ্তির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পাঠক্রমে যে সমস্ত তথ্য সংযুক্ত হয়েছে সেগুলি যেন সহজেই শিক্ষার্থীদের করায়ত্ত হয়। বেশির ভাগ সময় দেখা যায় পাঠক্রম প্রণয়নকারীরা (Curriculum Developers) যে

Scanned by CamScanner

সমস্ত অভিজ্ঞতা নির্বাচন করেন সেগুলি সব সময় সহজলভ্য হয় না। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে যেখানে গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুল, সেখানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় । ফলে পাঠক্রমে কার্যকারিতা হ্রাস পায়। তাই পাঠক্রম নির্বাচনের সময় অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে সমস্ত তথ্যের সহজলভ্য হয়।

(৪) **শিখন সহায়ক কৌশল** ঃ পাঠক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীর সামনে বাস্তব ও আকর্ষণীয় করে তোলা উচিত। তা না হলে শিখন-শিক্ষণ (Teaching learning) উদ্দেশ্যেই ব্যাহত হবে। আর বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক প্রদীপন (teaching aid) ব্যবহার করা হয়। এতে খুব সহজেই শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করে তোলা যায় এবং ফলত তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাই পাঠক্রম রচনার সময় এমন সব বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যাতে শিক্ষাদান কার্যের সময় যথোপযুক্ত শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ থাকে।

(৫) **শিক্ষকের যোগ্যতা** ঃ পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষকের যোগ্যতা বিবেচনা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি পাঠক্রম সফল রূপ পায় শিক্ষকের দ্বারা। অর্থাৎ পাঠক্রমের যথার্থতা নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতার উপর। জ্ঞানের জগতে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষক সেভাবে নিজেকে তৈরি করতে না পারার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত তারা পিছিয়ে পড়ছে। তাই পাঠক্রমে এমন সব উপাদান থাকবে যার সাহায্যে শিক্ষক তাঁর নিজের দক্ষতাটি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে যোগ্যতা বৃদ্ধি সহায়ক উপাদানগুলি হল তথ্যসূত্র বা উৎস (Source of knowledge), প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ (Reference Book) ইত্যাদি।

(৬) **বৃত্তিমূলক সুযোগ** ঃ পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বৃত্তির ইঙ্গিত থাকবে। এক্ষেত্রে পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির সঙ্গে পরিচিতি দান করবে। তার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বৃত্তিটি সে খুব সহজেই বেছে নিতে পারবে। পাঠক্রমের কাজ শুধুমাত্র কৌশল বা দক্ষতা আয়ত্তকরণে সহায়তা করা নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটিকে বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থী সঠিক বৃত্তিটি বেছে নিতে সমর্থ হবে। তাই পাঠক্রমে বৃত্তি পরিচিতি দানেরও পরিচিতি থাকা দরকার।

পাঠক্রম নির্ধারণের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির দিকে সংগতি রেখে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করা হলেও আরও অনেক বিষয় অনুল্লিখিত থেকে গেছে। যত

উপসংহার

বেশি উপাদান বিবেচনা করা সম্ভব হবে, পাঠক্রমের সংগঠনটিও তত মজবুত হবে। কারণ পাঠক্রম রচনায় প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বেশি করে প্রদান করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার পরিধিটি আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হবে। তাই পাঠক্রম নির্ধারণ করার সময় শিক্ষার্থীর সুযোগ-সুবিধাগুলির দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

Scanned by CamScanner